অধ্যায় - ৮

মানব জন্মের গুরুত্ব, শ্রী সাইবাবার ভিক্ষাবৃত্তি, রায়জাবাঈয়ের সেবা, শ্রী সাইবাবার শয়নকক্ষ, খুশালচন্দের প্রতি প্রেম।

গত অধ্যায়ে যেমনটি বলা হয়েছিল, এবার হেমাডপন্ত মানব জন্মের মাহাত্ম্য বিস্তৃত রূপে বোঝাবেন। শ্রী সাইবাবা কিভাবে ভিক্ষা অর্জন করতেন, বায়জাবাঈ বাবার কিরূপ সেবা করতেন, তিনি মস্‌জিদে তাত্‌য়া কোতে ও মহালাসাপতির সাথে কিভাবে শুতেন এবং খুশালচন্দকে তিনি কতখানি স্নেহ করতেন, তারই বিবরণ এই অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে।

মানব জন্মের মাহাত্ম্য ঃ-

এই বিচিত্র সংসারে ঈশ্বর লক্ষ - লক্ষ প্রাণী (হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী ৮৪ লক্ষ) সৃষ্টি করেছেন (যেমন মধ্যে দেব, দানব, গর্ন্ধব্য, জীব-জন্তু ও মানুষ ইত্যাদি) যারা স্বর্গ, নরক, পৃথিবী, সমুদ্র ও আকাশে বাস করে এবং ভিন্ন-ভিন্ন ধর্ম পালন করে। এই প্রাণীদের মধ্যে যাদের পুণ্য প্রবল তারা স্বর্গে বাস করে এবং নিজেদের সৎ কর্মের ফল ভোগ করে। যখন তাদের পাপ-পুণ্যের সমন্বয় ঘটে তখন ওরা মানব জন্মের ও মুক্তি প্রাপ্ত করার সুযোগ পায়। পাপ ও পুণ্য দুটিই নষ্ট হয়ে গেলে তারা মুক্ত হয়ে যায়। নিজের কর্ম বা প্রারব্ধ অনুসারে আত্মা জন্ম নেয় বা দেহ ধারণ করে।

মনুষ্য শরীর অমূল্য ঃ-

এ কথাতো ঠিক যে চারটে জিনিষ সব প্রাণীরই রয়েছে - আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন। কিন্তু সব প্রাণীদের মধ্যে মানবকে জ্ঞান একটি বিশেষ দান, যার সাহায্যে সে ঈশ্বর দর্শন করতে পারে। এইটি অন্য কোন প্রাণীর পক্ষে সম্ভব নয়। তাই দেবতারাও মানব জন্মকে ঈর্ষা করেন এবং পৃথিবীতে মানব দেহ ধারণ করার জন্য সর্বদাই লালায়িত থাকেন, যাতে শেষে মুক্তি প্রাপ্ত করতে পারেন।

অবশ্য অনেকেরই এই ধারণা যে মানব দেহ অতি দোষ যুক্ত। কৃমি, মজ্জা এবং শ্লেষ্মা দিয়ে ভরা, রোগগ্রস্ত, নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ী। নিঃসন্দেহে এই তথ্যটি অংশতঃ সত্য। কিন্তু এত দোষপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও মানব শরীরের মূল্য অনেক বেশী, কারণ জ্ঞান-

প্রাপ্তি এই দেহেতেই সম্ভব। মানব শরীর পাওয়ার পরই তো জানা যায় যে, এই শরীর নশ্বর এবং বিশ্ব পরিবর্তনশীল। এইরূপ ধারণায় বদ্ধ হয়ে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলিকে তিলাঞ্জলি দিয়ে, সৎ-অসতের বিবেক জাগলে ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার করা যেতে পারে। সুতরাং শরীরকে তুচ্ছ ও অপবিত্র মনে করে তার উপেক্ষা করলে, ঈশ্বর-দর্শনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে হবে। কিন্তু আবার শরীরকে অতি মূল্যবান মনে করে তার মোহে পড়ে থাকলে, আমরা ইন্দ্রিয়-সুখের দিকে প্রবৃত্ত হয়ে যাব এবং তখন আমাদের পতন সু-নিশ্চিত।

সুতরাং সঠিক পথ তো এটাই যে, শরীরকে উপেক্ষাও করা উচিত নয় আর তার প্রতি আসক্ত হওয়াও উচিত নয়। ঠিক একটা ঘোড়সওয়ারের মত ঘোড়ার প্রতি ততক্ষন মোহ থাকা উচিত, যতক্ষন সে সফর পুরো করে নিজের নির্দ্দিষ্ট স্থানে ফিরে না আসে।

তাই ঈশ্বর-দর্শন বা আত্ম-সাক্ষাৎকারের জন্য নিজের শরীরকে যুক্ত রাখা উচিত। এইটাই আমাদের জীবনের আসল লক্ষ্য। শাস্ত্রে বলে যে অনেক প্রাণী উৎপন্ন করার পরও ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন না; কারণ কোন প্রাণীই তাঁর অলৌকিক রচনা বুঝতে বা অনুভব করতে সমর্থ ছিল না। তাই তিনি একটি বিশেষ প্রাণী অর্থাৎ মানবজাতির উৎপত্তি করেন। মানুষের মধ্যে তাঁর লীলা, অদ্ভুত সৃষ্টি ও জ্ঞান প্রাপ্ত করার যোগ্যতা দেখে তাঁর খুবই আনন্দ ও সন্তুষ্টি হয় (ভাগবৎ স্কন্ধ ১১- -২৮ অনুসারে)। তাই মানব জন্ম বড়ই সৌভাগ্যসূচক। উচ্চ ব্রাহ্মণকুলে জন্ম হওয়া তো পরম সৌভাগ্যের লক্ষণ। কিন্তু শ্রী সাই চরণাম্বুজে প্রীতি ও তাঁর শরণাগতি প্রাপ্ত হওয়া, এটি সবের চেয়ে শ্রেয়।

মানুষের প্রচেষ্টা ঃ-

এই সংসারে মানব-জন্ম অতি দুর্লভ। প্রত্যেক মানুষের মৃত্যু তো নিশ্চিত এবং যে কোন সময়ই মৃত্যু তাকে আলিঙ্গন করতে পারে। এই ধারণাটিই দৃঢ় করে আমাদের নিজেদের লক্ষ্য প্রাপ্তির প্রতি সব সময় তৎপর থাকা উচিত। যেরকম হারানো রাজকুমারের খোঁজে রাজা সব রকম উপায় অবলম্বন করেন, ঠিক তেমনি কিঞ্চিৎমাত্র দেরী না করে নিজের অভিষ্ট সিদ্ধ হেতু শীঘ্রতা দেখানোই উচিত। সুতরাং সম্পূর্ণ উৎসাহের সাথে, আলস্য ও নিদ্রা ত্যাগ করে আমাদের সর্বক্ষণ ঈশ্বরের ধ্যান করা উচিত। এই রকম না করতে পারলে নিজেদের পশু তুল্যই মনে করতে হবে।

কিভাবে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত ঃ-

সুলভে সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত করার একমাত্র উপায় হলো - কোন যোগ্য সন্ত বা সদ্‌গুরুর (যাঁর ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হয়ে গেছে) চরণে আশ্রয় নেওয়া। যে লাভ ধার্মিক উপদেশ শ্রবণ করে বা ধার্মিক গ্রন্থ পড়ে পাওয়া যায় না, সেটা সহজেই এই ধরণের অসাধারণ আত্মজ্ঞানীদের সংসর্গে প্রাপ্ত হয়। যে আলো আমরা সূর্য্য থেকে পাই, তা বিশ্বের সমস্ত তারাগুলি একত্রিত হয়ে গেলেও পাওয়া যাবে না। ঠিক সেই রকমই যে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উপলব্ধি আমরা সদ্‌গুরুর কৃপা দ্বারা করতে পারি, সেটা গ্রন্থ বা উপদেশ দ্বারা সম্ভব নয়। তাঁদের প্রত্যেকটি গতিবিধি, মৃদু ভাষণ, গুহ্য উপদেশ, ক্ষমাশীলতা, স্থিরতা, বৈরাগ্য, দান এবং পরোপকারীতা, শরীরের উপর নিয়ন্ত্রণ, অহংকার শূণ্যতা ইত্যাদি গুণ গুলি যে রূপ এই পবিত্র বিভূতিদ্বারা আচরণে প্রদর্শিত হত, ভক্তরা সৎসঙ্গ দ্বারা সেগুলি প্রত্যক্ষ দেখতে পায়। এই ভাবে মস্তিষ্ক জাগ্রত হয় এবং দিনে -দিনে আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়। শ্রী সাইবাবা এই ধরনেরই সন্ত বা সদ্‌গুরু ছিলেন। যদিও তিনি বাহ্যরূপে এক ফকিরের মত অভিনয় করতেন, কিন্তু সর্বদা আত্মলীন হয়ে থাকতেন। তিনি প্রত্যেক প্রাণীকে ভালবাসতেন এবং তাদের মধ্যে ভগবদ্দর্শন করতেন। ইন্দ্রিয়-সুখের প্রতি তাঁর কোন আকর্ষণ ছিল না। বিপদের সম্মুখীন হয়ে তিনি কখনো বিচলিত হতেন না। তাঁর দৃষ্টিতে গরীব ও বড়লোকের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। যাঁর শুধুমাত্র কৃপাদৃষ্টি দ্বারা ভিখিরী রাজা হয়ে যেত, তিনি শিরডীর দ্বারে-দ্বারে ঘুরে ভিক্ষে চাইতেন। এই কাজটি তিনি এইরূপ করতেন।

বাবার ভিক্ষাবৃত্তি ঃ-

সেই শিরডী বাসীদের সৌভাগ্য কে কল্পনা করতে পারে, যাদের দ্বারে পরমব্রহ্ম স্বয়ং ভিক্ষুক রূপে দাঁড়িয়ে ডাক দিতেন - "ওগো মা, একটা রুটির টুকরো পেতে পারি?" এবং সেটা গ্রহণ করার জন্য হাত পাততেন। এক হাতে একটি বড় গেলাস ও অন্য হাতে একটি ঝোলা থাকত। কয়েকটি বাড়ীতে তো তিনি প্রতিদিনই যেতেন এবং কয়েকটি বাড়ীর সামনে দিয়ে শুধু ঘুরে আসতেন। তিনি জলীয় পদার্থ যেমন দুধ, ঘোল ইত্যাদি গেলাসে নিতেন ও ভাত বা রুটি ইত্যাদি অন্য শুকনো বস্তু ঝোলাতে ঢেলে নিতেন। বাবার জিভে কোন স্বাদ ছিল না, কারণ তিনি সেটা নিজের বশে করে নিয়েছিলেন। তাই বিভিন্ন খাদ্যবস্তুর চিন্তা তাঁর ছিল না। যা যা ভিক্ষেতে পেতেন সেগুলি সব মিশিয়ে নিয়ে সন্তুষ্টিপূর্বক গ্রহণ করতেন।

অমুক বস্তুটি সুস্বাদু কিনা সেকথা বাবা কখনো ভাবেন নি, কারণ তাঁর জিভে স্বাদের বোধই ছিল না। তিনি শুধু দুপুর পর্যন্ত ভিক্ষা করতেন, যদিও এটারও কোন বাঁধাধরা নিয়ম ছিল না। কোনদিন খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ফিরে আসতেন, আবার কোন-কোনদিন প্রায় বারোটা বেজে যেত। একত্রিত খাদ্য বস্তুগুলি একটা পাত্রে ঢেলে দিতেন। সেখানে কুকুর, বেড়াল, কাক ইত্যাদি সব রকমের প্রাণী আনন্দ সহকারে ভোজন করত। বাবা ওদের কখনো তাড়াতেন না। যে মেয়েটি মস্‌জিদে ঝাড়ু লাগাতো, সে রোজ রুটির দশ-বারোটা টুকরো নিয়ে যেত, কিন্তু কেউ কখনো ওকে মানা করত না। যিনি স্বপ্নতেও কুকুর - বেড়ালকে কখনো 'দূর-ছাই' করেননি তিনি সে নিঃসহায় গরীবদের কি করে রুটি দিতে আপত্তি করতে পারতেন? এমন মহান পুরুষের জীবন ধন্য। শিরডীবাসীরা তো প্রথম-প্রথম তাঁকে পাগলই মনে করত এবং তিনি এই নামে শিরডীতে একরকম বিখ্যাতও হয়ে গিয়েছিলেন। যিনি ভিক্ষের ক'টি টুকরোদ্বারা জীবন নির্বাহ করতেন, তাঁর সম্মান থাকেই বা কি করে? কিন্তু তিনি ত্যাগী, ধর্মাত্মা ও উদার হৃদয়ের মানুষ ছিলেন। যদিও তাঁকে দেখে চঞ্চল ও অশান্ত মনে হত, কিন্তু অন্তঃকরণে তিনি দৃঢ় ও গম্ভীর ছিলেন। তাঁর পথ গহন ও গুঢ় ছিল। তবুও গ্রামের কিছু সৌভাগ্য-শালী ও শ্রদ্ধাবান লোকেরা তাঁকে সঠিক চিনেছিল এবং এক মহান পুরুষ মেনে তাঁকে শ্রদ্ধা করত। এরই উদাহরণস্বরূপ একটা ঘটনা উল্লেখ করা হচ্ছে -

বায়জাবাইয়ের সেবা ঃ-

তাত্‌য়া কোতের মা, যাঁর নাম বায়জাবাই ছিল, দুপুরের সময় একটা টুকরীর মধ্যে রুটি ও সব্জি ভরে জঙ্গলে গিয়ে বাবাকে আহার করাবার জন্য খুঁজে বেড়াতেন। অনেক সময় অনেক দূর পর্যন্ত চলে যেতেন ও বাবাকে দেখতে পেয়ে তাঁর চরণ দুটি ধরে নিতেন। বাবা তো ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে থাকতেন। বায়জাবাই একটা শাল পাতা বিছিয়ে তার উপর রুটি, সব্জি ইত্যাদি সাজিয়ে বাবাকে খেতে অনুরোধ করতেন। ওঁর সেবা ও শ্রদ্ধার রীতি অতি বিচিত্র ছিল। প্রতিদিন বাবাকে জঙ্গলে খোঁজা ও খেতে অনুরোধ করা। ওঁর এই সেবা ও উপাসনার কথা বাবার শেষ সময় পর্যন্ত মনে ছিল। এই সেবার কথা মনে করে বাবা ওঁকে অনেক রকমের লাভ প্রদান করেছিলেন। মা ও পুত্র দুজনেরই বাবার উপর দৃঢ় নিষ্ঠা ছিল। ওঁরা বাবাকে সর্বদা ঈশ্বরের ন্যায় পূজণীয় মনে করতেন। বাবা কখনো-কখনো ওঁদের বলতেন- "ফকিরের জীবনই সত্যিকারের ঐশ্বর্য্য। এর কোন শেষ নেই। যাকে আমরা ঐশ্বর্য্য বলে মনে করি, সেটা খুব শীঘ্রই লুপ্ত হয়ে যায়।" কিছু বছর পর বাবা জঙ্গলে ঘোরা বন্ধ করে দেন। তিনি গ্রামে

থাকতে ও মস্‌জিদেই খাবার খেতে শুরু করেন। তাই বায়জাবাইও বাবাকে খুঁজতে বেরোবার কষ্ট থেকে মুক্তি পান।

তিনজনের শোওয়ার ঘর ঃ-

সেই সাধু পুরুষেরা ধন্য, যাদের হৃদয়ে ভগবান বাসুদেব সর্বদা বাস করেন। সেই ভক্তগণও ভাগ্যবান, যারা তাঁদের সান্নিধ্য প্রাপ্ত করতে পারে। এমনি দুজন ভাগ্যবান ভক্ত ছিলেন - ১) তাত্‌য়া কোতে পাটীল ২) ভগত মহালসাপতি। দুজনেই বাবার সান্নিধ্য দ্বারা লাভান্বিত হন। বাবা দুজনকেই সমানরূপে ভালবাসতেন। এই তিন মহানুভব নিজেদের মাথা পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর দিকে করে এবং মাঝখানে একে-অপরের পায়ের সাথে পা জুড়ে মস্‌জিদে শুতেন। বিছানায় শুয়ে-শুয়েই অর্দ্ধেক রাত্তির পর্যন্ত প্রেম পূর্বক কথাবার্তা ও বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতেন। যদি কোন জন ঘুমিয়ে পড়তেন তো অন্যজন তাকে জাগিয়ে দিতেন। তাত্‌য়া নাক ডাকা শুরু করলেই বাবা উঠে ওঁকে জোরে নাড়িয়ে ও মাথা ধরে জোরে টিপে দিতেন। আর মহালসাপতি ঘুমিয়ে পড়লে বাবা ওঁকেও নিজের দিকে টেনে, পায়ে ধাক্কা দিয়ে পিঠ থাপড়াতেন। এইভাবে তাত্‌য়া নিজের বাবা-মাকে বাড়ীতে ছেড়ে বাবার প্রেম ও প্রীতির বশে তাঁর সাথে মস্‌জিদে ১৪ বছর থাকেন। কত সুন্দর ছিল সেই দিনগুলি! সেগুলি কি কখনো ভোলা যেতে পারে? সেই ভালবাসার কিই বা উপমা দেওয়া যেতে পারে? বাবার কৃপার মূল্য কিভাবে নিরুপণ করা যেতে পারে? পিতার মৃত্যুর পর তাত্‌য়ার উপর ঘর–সংসারের দায়িত্ব এসে পড়ে, তাই তিনি নিজের বাড়ীতেই শুতে শুরু করেন।

রাহাতা নিবাসী খুশালচন্দ ঃ-

শিরডী নিবাসী গণপত তাত্‌য়া কোতেকে বাবা খুব ভালবাসতেন। তিনি রাহাতার মারোয়াড়ী শেঠ শ্রী চন্দ্রভানকেও খুব ভালবাসতেন। ওঁর মৃত্যুর পর বাবা ওঁর ভাইপো খুশালচন্দকেও খুব স্নেহ করতে শুরু করেন। বাবা সর্বদা ওঁর কল্যাণার্থে চিন্তিত থাকতেন। কখনো গরুরগাড়ীতে, কখনো ঘোড়াগাড়ীতে তিনি নিজের অন্তরঙ্গ বন্ধুদের সাথে রাহাতা যেতেন। বাবা যেই গ্রামের ফাটকে পা দিতেন, গ্রামবাসীরা সঙ্গে-সঙ্গে ওকে অপূর্ব অভ্যর্থনা জানাত। ওঁকে প্রণাম করে খুব ঘটা করে গ্রামের ভেতরে নিয়ে যেতো। খুশালচন্দ বাবাকে নিজের বাড়ী নিয়ে যেতেন। নরম আসনে বসিয়ে সুস্বাদু খাবার পরিবেশন করতেন। তারপর প্রসন্নচিত্তে খানিকক্ষণ গল্প-গুজব করতেন। শেষে বাবা সবাইকে আনন্দিত করে ও আশীর্বাদ দিয়ে শিরডী ফিরে আসতেন। শিরডীর

একদিকে রাহাতা (দক্ষিণে) ও অন্যদিক নিমগ্রাম (উত্তরে)। এই দুটি গ্রামের মাঝখানে শিরডী পড়ে। বাবা নিজের জীবদ্দশায় এই দুটি সীমা পার করে কখনো যাননি। তিনি কখনো রেলগাড়ী দেখেননি বা চড়েননি। তবুও তিনি প্রত্যেকটি গাড়ীর সময় ঠিক-ঠিক জানতেন। যারা বাবার কাছে ফেরার অনুমতি নিয়ে তাঁর আদেশানুসারে রওনা হত, তারা সকুশল গৃহে পৌঁছে যেত। অপর দিকে যারা বাবার আদেশ অবজ্ঞা করত, তাদের দুর্ভাগ্য ও দুর্ঘটনার সম্মুখীণ হতে হতো। এই বিষয়ে প্রাসঙ্গিক ঘটনা ও অন্যান্য বিষয় বর্ণনা পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত রূপে করা হবে।

এই অধ্যায়ের শেষে বাবার খুশালচন্দের প্রতি প্রেমের সম্বন্ধে টীকা দেওয়া হয়েছে। তিনি কিরূপ কাকা সাহেব দীক্ষিতকে রাহাতা গিয়ে খুশালচন্দকে শিরডী নিয়ে আসতে বলেন এবং সেইদিনই দুপুরে খুশালচন্দকে স্বপ্নে শিরডী আসতে বলেন- এ ঘটনাটি এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে না, কারণ এর বর্ণনা এই সৎচরিত্রের ৩০ অধ্যায়ে করা হয়েছে।

।। শ্রী সাইনাথার্পণমস্তু। শুভম্ ভবতু।।